Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 425
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 420 - 425
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সুন্দরবনের বদলের ইতিহাস ও শচীন দাশের ‘জল জঙ্গলের রয়ানি’

অধ্যাপক সাধন কুমার সাহা
বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ও
দুর্লভ শীল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : durlavshill@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Sundarbans, History, Change, Forest.

Abstract
Proper fiction on Sundarbans was initiated by novelist Monoj Basu. After that Sundarbans, as a subject, began to be noticed in the writings of the novelists like Shivshankar Mitra, Narayan Gangopadhyay, Shaktipada Rajguru, Baren Gangopadhyay, Tapan Bandyopadhyay, Amar Mitra and others. Sundarbans, surrounded by forests and rivers, was once almost isolated from the main land. Then a conflict began between the old thoughts and beliefs and the new with the entrance of modern civilization. As a result, the public life of Sundarbans began to change. The history of the change of public life of Sundarbans has been depicted in the novel ‘Jol Jongoler Royani’.

Discussion

(১)

‘কল্লোল’ লেখক গোষ্ঠীর হাত ধরে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন একটি ধারার সূচনা হয় - আঞ্চলিকতা। চলমান ধারার পাশাপাশি এই নতুন ধারায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনচর্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হতে থাকে উপন্যাস ও ছোটগল্প। ফলে বাংলা এবং বাংলার বাইরেরও ভূখণ্ড বাংলা উপন্যাসে ঠাঁই পেতে থাকে। চিরকাল রহস্যাবৃত, নোনাজল প্লাবিত শ্বাপদসংকুল বনভূমি সুন্দরবনও তাই বাংলা উপন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে। এখানকার বাউলে, মউলেরা জুগিয়েছে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনি। এখানকার মানুষের সুখ-দুঃখ, সংস্কার, বিশ্বাস পরিপুষ্ট জীবনের অনেক কাহিনিই উঠে এসেছে উপন্যাসে। সুন্দরবন ভিত্তিক যথার্থ কথাসাহিত্যের সূচনা ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর হাতে।[১] তবে বাংলা উপন্যাসের সূচনা-লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে সুন্দরবনকে চিত্রিত হতে দেখা যায়। এই আখ্যানের প্লট অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত সুন্দরবনের ভৌগোলিক প্রতিবেশের দ্বারা।[২] শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন উনিশ ও বিশ শতকের কয়েকজন অপ্রধান রচনাকারের হাতেও সুন্দরবনের বাঘ, জল, জঙ্গল চিত্রিত হয়েছে।[৩] তবে এগুলিকে কখনই সুন্দরবন-সাহিত্য বলা

যায় না, কেননা এই সব রচনায় সুন্দরবন মুখ্য বিষয় হিসেবে ধরা পড়েনি। মনোজ বসু অখণ্ড বাদা অঞ্চলের রূপকার। তাঁর 'জলজঙ্গল' ও 'বন কেটে বসত' উপন্যাস দুটি সুন্দরবনের সংগ্রামী মানুষের জীবন পাঁচালি, বৃত্তিকেন্দ্রিক জীবনের বিশ্বস্ত দলিল।[৪] শিবশঙ্কর মিত্র সুন্দরবন ভিত্তিক পাঁচটি উপন্যাস রচনা করেছেন। যথা— 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার', 'সুন্দরবন', 'বনবিবি', 'রয়্যাল বেঙ্গলের আত্মকথা' এবং 'বেদে বাউলে'। তাঁর সুন্দরবন কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি মূলত 'শিকার কাহিনি' হলেও বাদা অঞ্চলের সংগ্রামী লোকজীবনের ছবি দক্ষতার সাথে উপস্থাপিত। তিনি সুন্দরবনকে শুধু কাছ থেকেই দেখেননি দেখেছেন নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও। তাঁর নিজের ভাষায়—

> "আর এই আয়োজনে যেসব ঘটনা ও ছবি তুলে ধরা হয়েছে, তার একটিও অবাস্তব বা অলীক নয়। ঘটনাগুলি যেমন সত্য, তেমনি প্রধান চরিত্রগুলিও সত্য; তাদের নামগুলিও অবিকল আছে। এই চরিত্রগুলির অনেকে হয়তো ইহলোকে আর নেই, আবার অনেকেই আজও জীবিত। এরা সবাই এক দুর্ধর্ষ বনের সম্মুখে বাঙালীর বীরত্ব ও মহত্ত্বের প্রতিভূ।"[৫]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' এক অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি। নিম্নবাংলার নদী সমুদ্রের দেশে মাটির মতোই সমাজ আর জীবন যেখানে অপরিণত তার একটা রূপ যা লেখককে রোমাঞ্চিত করেছিল, চর ইসমাইলের পটভূমিকায় সেই রোমাঞ্চেরই জন্ম দিয়েছেন 'উপনিবেশ' উপন্যাসটিতে।[৬] এছাড়াও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ নদী সবুজ বন', সমরেশ বসু'র 'ঝিলেনগর', শক্তিপদ রাজগুরুর 'নয়াবসত', 'নোনাগাঙ', 'কুমারীমন', 'অধিকার', 'চরহাসিল', 'দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি', বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনবিবির উপাখ্যান', 'সন্ন্যাসী বাওয়ালি', 'নদীর সঙ্গে দেখা', 'বাগদা', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জল জঙ্গলের কাব্য', আব্দুল জব্বারের 'ইলিশ মারীর চর', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ', শিশির দাশের 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা', তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নদী মাটি অরণ্য', অমর মিত্রের 'ধনপতির চর', অমিতাভ ঘোষের 'ভাটির দেশ', সোহরাব হোসেনের 'গাঙবাঘিনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। আর এই ধারাতেই আমরা পেয়ে যাই শচীন দাশের 'অন্ধ নদীর উপাখ্যান', 'জল জঙ্গলের রয়ানি', 'নুন দরিয়া', 'নদী তরঙ্গের আয়না', 'আকালুদ্দি ও এক নদী' উপন্যাস পাঁচটি।

(২)

ঐতিহাসিক অতীতকে আশ্রয় করে, তথ্যের উপর ভিত্তি করে সামাজিক মানুষের জীবন ব্যাখ্যা করলেও মানুষের জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার তাঁর নেই। আবার সময় সচেতনতা ও পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ইতিহাসের উপজীব্য। ঐতিহাসিক অনন্ত জীবনের আভাস আনতে পারেন না, ইতিহাস সেই জীবনে অবান্তর। এই কাজটি করেন সাহিত্যিক। তবে কোনো সাহিত্যিক যদি সাহিত্যে মানসিকতার পার্থক্যকে সার্থক ভাবে বর্ণনা করতে পারেন তাহলে তিনি তাঁর রচনায় ইতিহাসের ধর্মকে আনতে সক্ষম হন। যেমন— এনেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে। আবার কোনো বিরল সাহিত্যিক যদি অন্য যুগের মনকে তাঁর রচনায় ধরতে পারেন এবং পাঠক যদি সেই মনকে পৃথক বলে চেনেন এবং স্বাভাবিক বলে মানেন তাহলেও সাহিত্য নিঃসন্দেহে ইতিহাসধর্মী হয়ে ওঠে। আসলে সাহিত্যিক ঘটনাপ্রবাহে ও চরিত্রে ইতিহাসের সময়কালের মেজাজটি তৈরি করতে সক্ষম হন। আসলে আখ্যানের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে, পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে অন্বিত ঘটনাপ্রবাহে, সাহিত্যিক যে মেজাজটি সৃষ্টি করেন সেটি ইতিহাসের সময়কালের মেজাজ। যে পটভূমিতে সাহিত্যিক তাঁর চরিত্রটিকে স্থাপন করেন, সেই পটভূমিটিও ইতিহাসের সময়কালের ভূমি। এই যে 'সময়', যেটি নিরন্তর, বিরামহীন কালস্রোত, যেটি ইতিহাস ও সাহিত্য দু'টি বিষয়েরই কেন্দ্রিয়চরিত্র, তারও তিনটি ভাগ রয়েছে। মানুষের জীবনে সময়ের প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে অশীন দাশগুপ্ত সময়ের তিনটি ভাগের কথা বলেছেন- 'বড় সময়', 'ছোট সময়' এবং 'ব্যক্তিগত সময়'।

অশীন দাশগুপ্তর এই সময় ধারণার উপর নির্ভর করে আমরা শচীন দাশের 'জল জঙ্গলের রয়ানি' উপন্যাসে সুন্দরবনের বদলের ইতিহাসকে বুঝে নিতে পারি। উপন্যাসের কাহিনির সময়কাল একুশ শতকের প্রথম দশক। তখন সদ্য বামফ্রন্টের পতন ঘটে নতুন এক সরকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নব্বইয়ের দশকে সুন্দরবন অঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেবার

যে কাজ শুরু হয়েছিল সেটি তখনও চলছে। সেই সাথে হরিশের স্মৃতিচারণার সূত্রে এসে যাচ্ছে কাকদ্বীপের তেভাগার আন্দোলন। তেভাগাকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনে যে শ্রেণি সংজ্ঞবদ্ধতা তৈরি হয়েছিল, আজ সেই সুন্দরবনে আধুনিকতার অনুপ্রবেশে স্বার্থান্বেষি মানসিকতায় মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আসলে ইতিহাসের 'বড় সময়'-এর প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে শচীন দাশ এই উপন্যাসে 'ছোট সময়'-এর বদলের ইতিহাসকেই তুলে ধরেছেন।

'জল জঙ্গলের রয়ানি' উপন্যাসে মূল কাহিনির পাশাপাশি এসেছে উপকাহিনিও। তবে উপন্যাসটি পাঠ করতে করতে আমাদের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে যায়। একটি বিশেষ দিক এদের মধ্যে বর্তমান - নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বুঝতে হবে এই দ্বন্দ্বের আলোচনার মধ্যে দিয়েই। যে বাদা অঞ্চল সমাজের মূল স্রোত থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন, যেখানকার মানুষের জীবন আবর্তিত হত আঞ্চলিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মধ্যে দিয়ে, সেই জনসমাজে এসে লাগছে আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতার ছোঁয়া, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। নতুন সময় এসে ধাক্কা দিচ্ছে পুরাতন সংস্কারবাদী মানসিকতাকে। সময়ের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পুরাতন প্যাটার্ন ভেঙে যাচ্ছে, পুরাতন ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী মানুষগুলো নতুন সময়ের প্রবল স্রোতের মুখে পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে। একটা সমাজ ভেঙে অন্য একটা সমাজের রূপ নিচ্ছে। শুধু বাইরের পরিবর্তনই ঘটছে না, সমাজের আন্তরধর্মেরও পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে চিন্তা-চেতনারও পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে।

ভাঙাচোরা অথচ দেখতে সুন্দর একটা নৌকা ভেসে এসেছিল একদিন নদী পথে। নৌকায় কেউ নেই। সামনের দিকটা তোবরানো। সেই নৌকা নিয়ে গাঁয়ের লোকেদের মধ্যে নানান মত তৈরি হল। বয়স্করা জানালো ও নৌকা ভয়ঙ্কর, ও নৌকা অপয়া, দানোয় পাওয়া। ও নৌকা গাঁয়ের ক্ষতি করবে। তাই ও নৌকা ওরকমই পড়ে থাক। যেরকম এসেছিল সেরকমই চলে যাবে। কিন্তু গায়ের এক যুবক নবনী, যে এতদিন মহাজনের নৌকোয় সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরে আনত, সে নৌকাটিকে ধরে ফেলল। দাবিদারহীন নৌকাটি মেরামত করে স্বপ্ন দেখলো সমুদ্র জয়ের। আর এর পাশাপাশি নৌকাটি নিয়ে তৈরি হল গ্রাম্য রাজনীতি, কিংবদন্তি। শেষ পর্যন্ত ওই নৌকাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হল সুন্দরবনের ভাটি অঞ্চলের জনজীবন।

পুরাতনের সাথে নতুন চেতনার দ্বন্দ্ব প্রধানত উঠে এসেছে দুটি চরিত্রের মধ্যদিয়ে- নবনী ও জয়নাল। নবনী, জয়নাল উপন্যাসে শুধু ব্যক্তিনামে আবদ্ধ থাকে না। তারা হয়ে ওঠে এক নতুন সময়ের প্রতীক। বহমান সময়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া এই নতুন সময়ের সাথেই বহমান সময়ের সংঘাত শুরু হয় অনিবার্য ভাবেই। কারণ নতুন সময় সবকিছু নতুন ভাবে গড়তে চায়। বুঝতে পারে পুরাতন সময়ের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোকে। এই সব ত্রুটির বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন ক্ষোভ, যন্ত্রণা, প্রতিবাদ থেকেই গড়ে ওঠে এক নতুন ভাষ্য। তাই পুরাতন যা কিছু তা নতুনের আগমনে তটস্থ হয়ে ওঠে। ফলে সংঘাত লেগেই যায়। উপন্যাসে 'দানোয় পাওয়া' ভাঙা নৌকা নবনী মেরামত করে গোনে মাছ ধরতে যায়- এই ঘটনাকে প্রতীকী তাৎপর্যে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে 'দানোয় পাওয়া' ভাঙা নৌকা আসলে পুরনো সংস্কার এবং বিশ্বাস; সেই নৌকা মেরামত করে, সকলের নিষেধকে অমান্য করে, সেই নৌক নিয়ে মাছ মারতে যাওয়া আসলে নতুন সংস্কার গড়ে তোলার চেষ্টা। নবনী আধুনিক মানুষ, আধুনিক সময়ের মানুষ।

হরিশের দুই ছেলের প্রথম জন ছিল অবনী। আর দ্বিতীয় জন নবনী। কুচকুচে কালো লম্বা শরীর, মাথার চুল কোঁকড়ানো, গায়ে অসীম শক্তি নবনীর। নবনীর হাতে জাদু আছে, সে বড়ো নদী চেনে, নদীর চরিত্র বোঝে। নদীর জন্য সে শহরে কাজ করতে যায়নি। নদী দেখলে সে পাগল হয়। নবনীর ইচ্ছা ছিল নিজের নৌকায় গভীর সমুদ্রে গিয়ে মাছ মারার। নৌকাটি পেয়ে সে নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছে। গ্রামের বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করেনি সে। মাদার মণ্ডলের কাছে ধার করে, কাঠ জোগার করে নৌকা মেরামত করে জলে ভাসিয়েছে। গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনেছে। সেই মাছ গ্রামের মানুষ গ্রহণ না করায় অভিমান করে চলে গেছে সে। আর ফেরেনি।

ভোমরাই ছিল পিতা নবনীর যোগ্য উত্তরাধিকারী সন্তান। সে পিতার মতোই গ্রাম্য সমাজের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে নৌকাটির ভেতরে গিয়ে দেখে এসেছে, তার বাবা নৌকায় আছে কি নাই। দানোয় পাওয়া এই নৌকার ভেতরে যাবার সাহস কিন্তু কেউ দেখাতে পারেনি। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় নৌকাটি ভোমরাকেও নিয়ে যায়।

> "জগদ্দলের বুক থেকে ওই নৌকাটা ফের হাওয়া। কখন যে চলে গেছে। হয় কাল রাতে অথবা আজ সকালেই সে উধাও হয়েছে। ... কিন্তু ভোমরা! সে কোথায় গেল? কোথায় যে গেল? খুঁজে খুঁজেও আর ভোমরাকে পাওয়া যায় না। সারা গ্রাম আবার এ নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে। নদী পাড়ে আবার এসে ভিড় করে তারা,..."[৭]

যুধিষ্ঠির, মোক্তার এরা সব পুরাতন ধ্যান-ধারণার লোক। যুধিষ্ঠির বলেছিল নৌকাটি দানোয় পাওয়া, তাই নবনী মাছ নিয়ে এলে নির্দেশ দেয়—

> "ও মাচ তুর কেউ ধরবে না নবনী। হাতের লাঠি টা তুলে জানায় ও মাচ তুর সব দানোয় পাওয়া। তা দানোয় পাওয়া মাচ কি কেউ ধরে? ও মাচ তুই সমুদ্রে ফেইলে দিয়ে আয়।"[৮]

মন্মথর কাছে নবনীর ঘটনা শোনার পরে মোক্তার জানায়—

> "তাহলি তো ওই ছেইলেরে গেরামে ঢুকতে দেওয়াই ঠিক নয়।"[৯]

শুধু তাই নয় জয়নালের কাছে মনুষ্যত্বই হলো বড় ধর্ম এটা শুনে মোক্তারের মনে হয়েছিল ছেলে ধর্মকে অবমাননা করছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। পুরাতনের বিদায় জানিয়ে নতুনের অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত থাকছে শাহরুখ খানের ভিডিও শো তে, সৌরবিদ্যুতের প্লান্ট বসানোর মধ্যে দিয়ে।

> "ভ্যানের সামনে একটা মাইক। এবং সেই মাইক থেকেই চিৎকারটা উঠছে তারস্বরে। ...ভিডিও শো... ভিডিও শো... আসুন আসুন ... টিকিট মাত্র পাঁচ টাকা ...শাহরুখ খানের ছবি... পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা..."[১০]

তাই মোক্তারের মুখে আমরা শুনতে পাই—

> "সত্যিই কি যে সব হতিচে। গেরাম আর সে গেরাম নেই এখন মন্মথ। কেউ কারো কতা শোনে না। আর ছেলেছোকরারাও হয়িচে তেমনি। দু'পাতা লেখাপড়া শিখি নিজেরে নিইয়ে ঝে কী ভাবতিচে। এই দেখ না, আমার ছেলেটা ...শহরি পইড়ে মাতাটাই একদম খারাপ। পরব মানে না ধর্ম মানে না ...তা আমিও তেমনি। পারিবারিক সবকিছু থেকি তারে একদম বাদ দিয়ে দিছি। না টাকা কড়ি না জমিজমা।"[১১]

ছেলে জয়নালকে মোক্তার ত্যাজ্য পুত্র করেছে। সম্পত্তি থেকে করেছে বঞ্চিত। জয়নাল মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে এখন কলকাতায়। জয়নাল ইতিহাসে পিএইচ.ডি করছে। মোক্তার এটা চায়নি। মোক্তার চেয়েছিল ছেলেকে সংসারি করে কৃষিকাজে লাগাতে বাকি ছেলেদের মতন। কিন্তু শিক্ষিত জয়নালের এখন বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। জয়নাল গ্রাম্য সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে গেছে। তাই আসাদের সঙ্গ তার আর ভালো লাগে না। আসাদ শাহরুখ খানের ভিডিও শোতে আসতে বললে সে আগ্রহ দেখায় না। জয়নালের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সমস্ত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়। তার কাছে ধর্মপালনের চেয়ে বড় মানবিক আচার পালন।

উন্নয়নের নামে সুন্দরবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা মেনে নিতে পারে না জয়নাল। সৌর প্লাণ্ট বসানো প্রসঙ্গে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার মিহির বিশ্বাসকে জয়নাল বলে—

> "উন্নয়নের নামে জঙ্গলকে উন্মুক্ত করে দেবেন তা কী করে চলবে? এত উৎপাত কিন্তু আমাজন রেইন ফরেস্টে নেই! কুমায়ুনের জঙ্গলেও পাবেন না-"[১২]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 425
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সময় যে বদলাচ্ছে তা মোক্তার ধরতে পারেনি। কিন্তু জয়নালের মা ধরতে পেরেছিল। একটি চিঠিতে মা মীরাতুন জয়নালকে লিখেছে—

> “তুমি কোথাও ভুল করো নাই। আবার তোমার আব্বাও বুঝি তার দিক দিয়া ঠিক। তিনি যেভাবে জীবনকে দেখিয়া আসিয়াছেন জীবন তাহার কাছে আজও তেমনি একই ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। তোমার নতুন নতুন ভাবনা তিনি মানিতে পারিবেন কেন? কিন্তু সময় বদলাইতেছে। সময়ের যে পরিবর্তন হইতেছে তাহা এই ভাটি দেশে থাকিয়াও আমি টের পাইতেছি। ...”[১৩]

মীরাতুন এই উপন্যাসে এমনকি ভাটি দেশের জনসমাজে একমাত্র ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র। সৃষ্টিশীল নারী সে। সে কবিতা লেখে। জয়নাল বাড়িতে এলেই সে খুশি হয়, কারণ তখনই মন খুলে দুটো কথা বলতে পারে সে।

এভাবে উপন্যাসে পুরাতনের বিদায় জানিয়ে নতুনের আগমন বার্তা দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের জনজীবনে সৌর আলোর ব্যবস্থা হয়ে যায়। “টিভি চলবে পাখা ঘুরবে... বিপ্লব, বুঝলেন টোটাল একটা আলোর বিপ্লব! প্রযুক্তির বিপ্লব!”[১৪] আলো আসছে। সুন্দরবনের জনজীবন পাল্টে যাচ্ছে। তেমনি মারাও পড়বে যারা জীবনকে পাল্টাতে পারবে না সময়ের সাথে। নবনী ও জয়নাল মানেই আলোর দিকে যাত্রা। সেই আলোতে পৌঁছনোর প্রস্তুতি সারা উপন্যাস জুড়ে। উপন্যাসে যেন তারই অনুশীলন। তাই উপন্যাসের শুরুতে যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, উপন্যাসের শেষে আলোর আগমনে দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নতুন সময়ের আগমন দেখানো হয়েছে। নতুন সময় অবশ্যম্ভাবী ভাবেই এসে পরে, কিন্তু সেই সময়কে সকলে গ্রহণ করতে পারে না, মানে নিজেকে পাল্টাতে পারে না। তাই তো দার্শনিকের মত লেখক জানালেন,

> “আলোকে কেউ ব্যবহার করে... কেউবা আবার না জেনে তার স্পর্শে মরেও যায়।”[১৫]

অর্থাৎ যে অন্ধকার থেকে শুরু হয়েছে সুন্দরবনের যাত্রা সেই অন্ধকার অতিক্রম করে সুন্দরবন যেতে চাইছে জীবনের দিকে। হতে চাইছে আলোকাভিমুখী। লেখক নিরপেক্ষভাবে এই সবকিছুর ডকুমেনটেশন করেছেন।

ভাটির দেশের জনসমাজে নারী পাচার একটি সাধারণ ঘটনার মতো। কামাল ধূর্ত শেয়ালের মতো। সে প্রথমে তোলাবাজ জলিলের দলে ছিল। জলিল খুন হবার পর জলিলের বিবি নাসিফার সাথে নারী পাচার করেছে। নাসিফার পরে যুক্ত হয় কুলসুমের সাথে। কুলসুম ও কামাল ষড়যন্ত্র করে নারী পাচার করে মোটা টাকা রোজগার করে। জাহিরাকেও তারা পাচার করতে চায়। কিন্তু কামাল জাহিরার প্রেমে পড়ে যায়। জাহিরার বোন তাহিরাকে কুলসুমের হাতে দিয়ে জাহিরার সাথে সংসার করতে চায় কামাল। জাহিরা কামালের সাথে বাড়ি ছেড়ে পালায়। যেখানে পিতা-মাতার পছন্দই শেষকথা হত, সেখানে জাহিরার নিজেই পাত্র পছন্দ করে বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্তও তো একরকম পুরাতন ধ্যান ধারণার প্রতি প্রতিবাদ। এভাবেই শচীন দাশ উপন্যাসে সুন্দরবনের বদলের ইতিহাসকে দলিলিকরণ করেছেন।

Reference:

১. নস্কর, সনৎকুমার, ‘কথাসাহিত্যে সুন্দরবন : পরিপ্রেক্ষিত ও শিল্পিত জীবন’ (দ্রঃ সংকলন ও সম্পাদনা বরেন্দু মণ্ডল, ‘দ্বীপভূমি সুন্দরবন’), ছোঁয়া, প্রথম প্রকাশ ২০২০, পৃ. ২৬৩
২. তদেব, পৃ. ২৬০
৩. তদেব, পৃ. ২৬১
৪. দাস, সুবর্ণ, ‘সাহিত্যে সুন্দরবনের জল, জমি ও জঙ্গল’ (দ্রঃ নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল সম্পাদিত ‘সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা’, সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড), সমকালের জিয়নকাঠি, নবম বর্ষ যুগ্ম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ১৬৭
৫. মিত্র, শিবশঙ্কর, মুখবন্ধ, ‘সুন্দরবন সমগ্র’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃ. ১০

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 425
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. মণ্ডল, দেবজ্যোতি, ‘সুন্দরবন ও বাংলা সাহিত্য’, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, পৃ. ১২০
৭. দাশ, শচীন, ‘জল জঙ্গলের রয়ানি’, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ১৫৭
৮. তদেব, পৃ. ৮৭
৯. তদেব, পৃ. ১০৮
১০. তদেব, পৃ. ৭৭
১১. তদেব, পৃ. ১০৮
১২. তদেব, পৃ. ৪১
১৩. তদেব, পৃ. ১০৯
১৪. তদেব, পৃ. ১২৭
১৫. তদেব, পৃ. ১২৬

Bibliography:

শচীন দাশ, ‘জল জঙ্গলের রয়ানি’, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩
শিবশঙ্কর মিত্র, ‘সুন্দরবন সমগ্র’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮
দেবজ্যোতি মণ্ডল, ‘সুন্দরবন ও বাংলা সাহিত্য’, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬
বরেন্দু মণ্ডল সম্পাদিত, ‘দ্বীপভূমি সুন্দরবন’, ছোঁয়া, প্রথম প্রকাশ, ২০২০
অশীন দাশগুপ্ত, ‘প্রবন্ধ সমগ্র’, আনন্দ, সপ্তম মুদ্রণ, মে ২০২৩
নাজিবুল ইসলাম, মণ্ডল সম্পাদিত, ‘সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা’, সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, সমকালের জিয়নকাঠি, নবম বর্ষ, যুগ্ম সংখ্যা ডিসেম্বর, ২০০৮